প্রশান্ত ভট্টাচার্য

এসো, উদ্দালকের পিছু পিছু

[ড. নারলা ভেঙ্কটেশ্বর রাও প্রণীত 'পভার্টি অব ইনটেলেকচুয়ালইজম ইন ইনডিয়া' গ্রন্থের পর্যালোচনা]

নতুন মহাকাব্য লেখা হল না গেরিলা ছন্দে ঠিকই, তবু সত্তরের দশক আমাদের চেতনার পরতে পরতে মিশিয়ে দিল— কেউ দেবতা নয়, কেউ দানব নয়। ফলে যে মূল্যায়ন আমাদের জাতীয় চরিত্র সম্পর্কে নতুন করে দেখা দিল সত্তরের দশকের গোড়ায় বা কিছু আগে, যা শুরু করেছিলেন কয়েকজন বুদ্ধিজীবী-রাজনীতিক কিংবা রাজনীতিক-বুদ্ধিজীবী তার ঢেউ একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়েছিল এই উপমহাদেশের জ্ঞান ও মেধা-চর্চার কেন্দ্রগুলিতে। কেউ নীরবে কেউ বা সরবে তাঁদের মেধাবী চিন্তা ও প্রকরণ অব্যাহত রেখেছিলেন। কলকাতা বা কলকাতা-কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীদের সুপ্ত আত্মশ্লাঘা— একমাত্র তাঁরাই সংস্কারমুক্ত হয়ে নির্মোহ দৃষ্টিতে সমাজের গতি-উপগতি অধ্যয়ন করতে পারেন কিংবা নিজেদের অতীতকে একজন প্রথাতিগ খনকের মতো পারদর্শিতায় খুঁড়তে পারেন; পারেন নির্মম সত্য সোচ্চারে বলতে। এঁদের এই মানসিক অবস্থান অমূলক নয় কেননা আর যাঁরা 'অকোলকেতে' কিম্বা অবাঙালি তাঁদের কাজকর্মের হদিশ দেয়া বা রাখাটা ঠিক এখানকার সংবেদনশীল সংস্থাগুলির কাজ নয়। ফলে বৃহত্তর ভারত সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞানতা এখনও যেমন পাথরপ্রমাণ আগামী দিনেও তা পর্বত বই মূষিক হবে না।

এক বছর আগে আমার হাতে দক্ষিণ ভারতীয় বিবেকবান বুদ্ধিজীবী ড. নারলা ভেঙ্কটেশ্বর রাও-এর 'ভারতীয় বুদ্ধিবাদের দীনতা' (Poverty of Intellectualism in India) বইটি এসেছে। সুধপাঠ্য এমন বইটি পড়ে আমিই বা কি করলাম! ক'জনকে পড়াতে পারলাম! কয়েকজন বন্ধুকে মুখে বলা কিম্বা অংশবিশেষ পড়ে শোনানো ছাড়া কি-ই বা করেছি! অথচ এমন একটি বইয়ের অবাধ প্রচার ও পাঠ হওয়া উচিত ছিল। বহুল প্রচারের জন্য অনুবাদ জরুরি ছিল।

'ভারতীয় বুদ্ধিবাদের দীনতা' ড. নারলার দুটি বক্তৃতার সংকলন। ১৯৭৩ সালে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব কন্নড় স্টাডিজ-এর আমন্ত্রণে তিনি দুটি বক্তৃতা দেন; বিষয়বস্তু ভারতের বুদ্ধিবাদী চিন্তার স্রোত— সেই যাজ্ঞবল্ক থেকে রামমোহন হয়ে গান্ধী পর্যন্ত প্রভাবশালী চিন্তাবিদ্‌দের মতাদর্শের ভিত্তি ও স্বরূপ। বক্তৃতাকে তিনি দুটি অংশে বিভক্ত করেছেন— (১) প্রাচীন ও মধ্যযুগ, (২) আধুনিক যুগ।

সাধারণভাবে এ ধরনের বইগুলিতে স্বীয় মতপ্রকাশে অসাহসী হয়ে যে ভাষা ও শব্দের ব্যূহ এবং চালিয়াতি থাকে ড. নারলার বইয়ে তা কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই বইটির প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার আগে ড. নারলার ও তাঁর কাজ-কর্মের সঙ্গে পাঠকদের একটু পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। BIRDS বলেছে :

'অহিন্দীভাষী অঞ্চলের লোকেরা, বিশেষত দাক্ষিণভারতীয়রা হিন্দীভাষী অঞ্চলের লোকজনের তুলনায় অনেক ব্যাপারেই ভিন্ন। যেমন ওদের তুলনায় তারা আরও উদারমনা। হিন্দীভাষী অঞ্চলের সংকীর্ণ মানসিকতার ফলে সেখানকার লোকজনেরা দাক্ষিণভারতীয়দের বুদ্ধিবাদী কাজ-কর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ। তাঁরা বুদ্ধিচর্চার জগতে দাক্ষিণ-ভারতীয় অতীত গুম্ভদের··· এবং আমাদের কালের ড. নারলা সম্পর্কেও একেবারেই অজ্ঞ।'

BIRDS— ব্যাঙ্গালোর ইনস্টিটিউট অব্ রিসার্চ ইন ডেমোগ্রাফি অ্যান্ড সোসাইটি-র উপরোক্ত মন্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত না হলেও এটা ঠিক যে প্রচার ও প্রসার মাধ্যমগুলির একদেশদর্শিতায় আমরা অনেকেই এঁদের জানি না, চিনিও না। অথচ ড. নারলা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার আগ্রহে যখন আমি খোঁজ-খবর চালাচ্ছি তখন আমার হাতে এল ড. নারলা রচিত একটি পঁচিশ পৃষ্ঠার নাটিকা 'জাবালি'। নাটিকাটির বস্তুনিষ্ঠ বক্তব্য আমাকে বিস্মিত করে। পঁচিশ পৃষ্ঠার নাটিকাটির উনষাট পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা লিখেছেন নাট্যকার। এই দীর্ঘ ভূমিকায় তিনি তাঁর বক্তব্যের তথ্য ও তত্ত্বগত সমুচ্চয় ঘটিয়েছেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আর. জি. ভাণ্ডারকারের (পুনার ভাণ্ডারকার ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট যাঁর নামাঙ্কিত) গৃহীত সিদ্ধান্তকে শিরোধার্য করে তিনিও বলেন— 'এটা খুব করুণ যে আমাদের বেশিরভাগ বি.এ., এম.এ-রাও রামায়ণকে ইতিহাস বলে মনে করে।' তাঁদের কথাবার্তার বিষয়বস্তুও রামায়ণ-মহাভারতের জনপ্রিয় সংস্করণগুলি ভিত্তি করে, সংস্কৃত সংস্করণগুলিকে ভিত্তি করে নয়। আজকে ড. নারলা বা ভাণ্ডারকার-রা জীবিত থাকলে বলতেন এখন সমস্ত কথাবার্তা হয় টি. ভি-র জনপ্রিয় সিরিয়াল দুটোকে ভিত্তি করে। 'বাল্মীকি রামায়ণ' না বলে উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই নারলা 'সংস্কৃত রামায়ণ' বলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব যুক্তি আছে। আর সেই যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করেই তিনি বাল্মীকি রামায়ণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখান তিন নয় রাজা দশরথের স্ত্রীর সংখ্যা সাড়ে তিনশ'। পাঠক অবাক হবেন না, অবিশ্বাসও করবেন না ; এটাই সত্যি। একটু নজর করে পড়ুন বাল্মিকী রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের চৌত্রিশতম সর্গটি। যদিও নারলার সন্দেহ গভীর— আমাদের বইয়ের আলমারিতে জনপ্রিয় সংস্করণ ছাড়া সংস্কৃত রামায়ণ নেই। নারলা দ্বিধাহীন কণ্ঠেই দাবি করেন তিনি একবার নয় একাধিক বার রামায়ণ পাঠ করেছেন। আর তাঁর এই ঘোষণা অমূলক নয়, দাম্ভিকতা নয় যখন তাঁর লেখায় উদ্ধৃত অযোধ্যাকাণ্ডের অষ্টম সর্গ থেকে আমরা জানতে পারি যে রাম এক এবং একমাত্র সীতাপতি নয়, তাঁরও একাধিক স্ত্রী ছিল। এবং 'পুরুষোত্তম' রামের যথার্থ

অনুজ ভরতেরও সংখ্যার বিচারে স্ত্রীভাগ্য নেহাত কম ছিল না।

একজন মুক্তমনা, অন্তর্ভেদী পাঠকের মতো সংস্কৃত রামায়ণ অধ্যয়ন করে, জনপ্রিয় সংস্করণগুলির সঙ্গে তাঁর সেই পাঠের তুলনা করে, রামায়ণের বহু অনালোচিত দিক তিনি যেভাবে তুলে ধরেছেন 'জাবালি'-র ভূমিকাতে তা পাঠকনির্বিশেষের কাছে এক বিরল পাওনা। আমরা পাঠকরা বিতর্ক করব, বিবাদ করব, পৃষ্ঠা-পৃষ্ঠান্তরে আমাদের মতান্তর হবে তবুও তাঁর এই পরিশ্রমী-নিষ্ঠাসহ কাজের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে বাধ্য হব।

কী আছে জাবালি-তে

পুনরুত্থানবাদী-মৌলবাদীদের অধুনা দৌরাত্ম্যের অনেক আগেই ১৯৬৫ সালে এই নাটিকাটি রচিত হয়। ভরতের নাট্যশাস্ত্র বা অ্যারিস্টটলীয় পোয়েটিকসের বিচারে কিংবা স্ট্রাকচারালিস্ট বা ইদানিংকালের উত্তর আধুনিকদের শবচ্ছেদে 'জাবালি' কতটা নাটক হয়েছে সেটা জানি না কিন্তু এমন একটি বিষয় যে আজকের ভারতীয় আর্থ-সামাজিক অবস্থা ভীষণভাবে দাবি করছে সেটা বলতে করো দ্বিধা হওয়া উচিত নয়।

নাটিকার স্থান— চিত্রকূট পর্বতের নিকটবর্তী স্রোতস্বিনী মন্দাকিনীর তীর। পাশে একটি আমগাছ।

নাটিকার কাল— রামের বনবাস।

নাটিকার পাত্র— জাবালি, রামচন্দ্র, বশিষ্ঠ।

পুরুষোত্তম রামের মনের আকাশে কোন মেঘ নেই। কিন্তু জাবালি সেখানে মেঘের আবির্ভাব ঘটাচ্ছেন, ভয়ঙ্কর অথচ স্বাভাবিক কতগুলি জিজ্ঞাসার মুখে ফেলে দিয়েছেন শ্রীরামচন্দ্রকে।

রাম : আপনার কথাগুলি বড়ো অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর।

জাবালি : তুমি এখনও খুব তরুণ এবং অনভিজ্ঞ। মনে রেখ যা সাদা তাই দুধ নয় : যা স্বচ্ছ তাই জল নয়।

জাবালি রামকে সতর্ক করতে তাঁর আশঙ্কার কথা বলেন। তাঁর আশঙ্কা ভরত একদিন সিংহাসন নাও ছাড়তে পারেন। বিরক্ত রাম বলে ওঠেন— 'মনে হচ্ছে আমার ভাইকে যেন আমার চেয়েও ভাল চেনেন আপনি!'

জাবালি : রাঘব! তুমি জান ক্ষমতার কি পরিমাণ অসৎ প্রভাব থাকতে পারে? সিংহাসনের আকাঙ্ক্ষা দুই ভাইয়ের মধ্যে গরলের বন্যা বইয়ে দিতে পারে, পারে পিতা-পুত্রের মধ্যে চিরকালীন···

জাবালির যুক্তির বুনোটে ক্লান্ত হয়ে রামচন্দ্র নিজেকে নির্বোধ বলে ভাবতে শুরু করে— একে একে সংসারের জটিল স্বার্থান্বেষী জটিলতাগুলি তার মাথায় ঢুকে পড়ে। রামচন্দ্রের হতাশ কণ্ঠস্বর :

'আপনি আপনার যুক্তি দিয়ে আমাকে দিশেহারা করে দিচ্ছেন। আপনার মেধাবী যুক্তিগুলি স্মৃতি আর শ্রুতির পরিপন্থী!'

সুপণ্ডিত জাবালির উত্তরটি মনে রাখার মতো: 'আমার কথাগুলো শ্রুতি-স্মৃতির পরিপন্থী হতে পারে কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে তা যুক্তির পরিপন্থী নয়।'

শেষপর্যন্ত রামচন্দ্র প্রায় পিতৃশর্ত রক্ষা করতে পারবেন কিনা এই অবস্থা যখন সৃষ্টি হতে চলেছে তখনই সেই নির্জন স্থানে উপস্থিত হন দশরথের প্রধান পুরোহিত বশিষ্ঠ। নাটকীয়ভাবেই অবস্থার পরিবর্তন হয়। জাবালি চরিত্রের দুর্বল অথচ স্বাভাবিক দিকটি প্রকাশ পায়, আর অবাক হওয়ার পালা শুরু হয় শ্রীরামচন্দ্রের। বশিষ্ঠের অনুগত জাবালিকে দেখে ও তাঁর কথা শুনে রামচন্দ্রের সমস্ত পূর্ব সংশয় কেটে যায়। শুরু হয় নতুন সংশয়— 'সত্য কি? মিথ্যে কি? শঠতা কি?'

প্রচলিত বা চাপিয়ে দেয়া স্মৃতি-শ্রুতি সম্বলিত যুক্তি ও জ্ঞানের ফাঁপা দিকটি অল্প পরিসরে তুলে ধরে কতগুলি প্রশ্ন তুলেই নাটিকাটি শেষ হয়।

'জাবালি' সহ তাঁর অ্যাকাডেমি পুরস্কারে সম্মানিত 'সীতাজোস্যাম' (Seethajosyam) নাটক দুটি তেলেগু থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন পি. এস. শ্রীধর মূর্তি। নাটক দুটি 'লাস্ট ওয়ার্ড অন্ রামায়ণ' শীর্ষকে প্রকাশ করেছে BIRDS. শ্রীধর মূর্তির লেখা থেকেই জানা যায় হায়দ্রাবাদে নারলার অনুগামীরা প্রতিষ্ঠা করেছেন— 'নারলা ইনস্টিটিউট অব্ নিউ থট্'।

বুদ্ধিবাদীরা অসন্তুষ্ট হবেন না

জাবালি লেখার আট বছর পরে ১৯৭৩ সালে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. নারলার বক্তৃতা দুটি তাঁর চিন্তার ক্রমবর্ধমান অবস্থাকেই প্রতিফলিত করছে। 'ভারতের বুদ্ধিবাদের দীনতা'— এই শীর্ষকটির জন্যই আপত্তি উঠতে পারে— বুদ্ধির জগতে আমরা কেউ দরিদ্র থাকতে আগ্রহী নই। বিজ্ঞানের পক্ষে অনাকাঙ্ক্ষেয় হলেও ওঁর বক্তৃতাতে এমন কিছু বিষয় এসেছে কিম্বা সিদ্ধান্ত আকারে বেরিয়ে এসেছে যা মৌলিকতার দাবি রাখে। বক্তৃতার মধ্যে সবচেয়ে জরুরি এবং সিদ্ধান্ত আকারে যে মতটি প্রকাশ পেয়েছে তা ওঁর দ্বিতীয় বক্তৃতার প্রথমেই— 'আজ থেকে তিন হাজার বছর আগে উদ্দালকের পরিবর্তে যাজ্ঞবল্ক্যকে আমাদের জাতীয় দার্শনিক হিসাবে নির্বাচন করাটাই আমাদের বুদ্ধিবাদের ইতিহাসে মস্ত ভুল। এবং আধুনিক যুগে আমরা আবার ওই রকম একটি ভুল করেছি। যদি সত্যিই আমরা এই আধুনিক ভারতে একটি দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে চাইতাম তবে আমাদের অবশ্যই বিবেচনা করা উচিত ছিল রাজা রামমোহন রায়ের পরিবর্তে হেনরি লুই ডিরোজিও-কে।'

এমন বাঙালি নিশ্চয়ই কেউ নেই যে এরকম বাক্য পাঠ করার পর বইটি ও তার লেখক সম্পর্কে কৌতূহলী হবেন না। আরও একটি সাহসী এবং সুচিন্তিত বাক্য পেলাম প্রথম বক্তৃতাটির শুরুতেই, যেখানে তিনি বুদ্ধিবাদ কি এই ব্যাখ্যা শুরু করছেন— 'আমি বলতে পারি এম. এন. রায় একজন বুদ্ধিজীবী হলে, এম.কে. গান্ধী বুদ্ধিজীবী নন।' আমার পাঠকদের মানসিকতা আমার পক্ষে অননুমেয় নয় তাই আমি উল্লেখ করছি কেন নারলা মানবেন্দ্রনাথ রায়কে বুদ্ধিজীবী বলে মনে করলে গান্ধীকে করছেন না "উভয়েরই বুদ্ধি ছিল, উভয়েরই যুক্তি ছিল, বিষয়ের পার্থক্য বোঝবার ক্ষমতা ছিল। তথাপি আমরা রায়ের লেখায় কদাচিৎ আত্মার উল্লেখ পাই, যা পাই তাও ঠাট্টার ছলে। অন্যদিকে আমরা লক্ষ করলেই দেখতে পাব, গান্ধী সব সময় আত্মা সম্পর্কে, আত্মার শক্তি সম্পর্কে বলেছেন। এমনটা নয় যে তিনি বুদ্ধিকে চিরকালই বাতিল করেছেন, কার্যত তিনি ভাবতেন আত্মা মুখ্য, বুদ্ধি গৌণ; বাস্তবে বুদ্ধি আত্মার অনেক পিছনে পড়ে আছে। তিনি বলতেন, 'মহৎ কাজ শুধুমাত্র বুদ্ধিমত্তা দ্বারা সমাধান হয় না, তারজন্য লাগে আত্মিক উদ্যোগ বা আত্মার শক্তি।' রায় এবং গান্ধীর ঠিক এমনি একটি উদাহরণ আমরা উদ্ধার করতে পারি ইতিহাস থেকে; তাঁরা হলেন— উদ্দালক ও যাজ্ঞবল্ক।"

আমাদের আপত্তি থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু নারলার কোন অস্পষ্টতা নেই। তিনি তাঁর যুক্তির পরম্পরায় পৃষ্ঠা পৃষ্ঠান্তরে চলে যান প্রাচীন ও মধ্যযুগের বুদ্ধিবাদের স্রোতে কোথায় দৈন্য বাসা বেঁধেছিল তা দেখাতে। যাজ্ঞবল্ক ও উদ্দালকের তুলনামূলক আলোচনা করে দেখান যাজ্ঞবল্ক একাধারে কীভাবে বিষয়ী ও দার্শনিক ছিলেন এবং তিনি সবটাই করতেন অদ্ভুত পারদর্শিতায়, অভিনব কুটভাষে। সংসারে শান্তি অটুট রাখতে বিষয়ী স্ত্রী কাত্যায়নীকে করেছিলেন পার্থিব সম্পদের একক অধিকারিণী। আর বিদুষী মৈত্রেয়ীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন অমৃতের পাত্র— বিদ্যা ও জ্ঞান।

ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যগুলিতে উদ্দালক ও যাজ্ঞবল্ককে যথাক্রমে আদিতম প্রকৃতিবাদী ও আদি ভাববাদী বলে দেখানো হয়েছে। উদ্দালক সৃষ্টিতত্ত্ব ও দেবতার জন্মতত্ত্বের যে ধারণা চলে আসছিল তাতে ফাটল ধরিয়েছিলেন। 'উদ্দালক জাতক'-এ পাওয়া যায় বিশ্ব সম্পর্কে তাঁর বস্তুবাদী ধ্যান ধারণা।

উদ্দালকের প্রকৃত বিরোধী যাজ্ঞবল্ক বিশ্বের পরমাত্মাকে সঙ্গীতের যন্ত্র বলে মনে করতেন এবং পৃথিবীর উপাদানগুলোর স্বরের মতো বেরিয়ে এসেছে। যাজ্ঞবল্কের কাছে বিশ্বজগৎ হচ্ছে মায়া। যদিও বিদেহ-র রাজা জনকের সমসাময়িক দার্শনিক প্রবরের মতাদর্শ ও জীবনযাপনের মধ্যে ছিল বিস্তর পার্থক্য।

ম্যাক্সমুলার-কৃত ভারতীয় দর্শনের ছটি শাখার কথা উল্লেখ করেও তিনি বলেন 'পূর্বমীমাংসা' পুরোহিতদের যাগযজ্ঞ শেখাবার জন্য জার্মানীর তৈরি ব্যবহারিক গ্রন্থ। আর, পতঞ্জলীর 'যোগ' মনো-স্বাস্থ্য অভিজ্ঞতায় ক্লান্তদের ম্যানুয়াল। আজকের দিনে

'যোগ' ভাল লাভজনক ব্যবসা। আসলে চিন্তা করার জন্য চিত্তকে পরিশুদ্ধ করার তথাকথিত পদ্ধতিটি 'যোগ'। কে. এস. মুর্তিকে উদ্ধৃত করে তিনি জানান— 'যোগের লক্ষ্য চিন্তাকে হত্যা করা। মানুষের ইতিহাস হচ্ছে চিন্তার ইতিহাস; হোমোস্যাপিয়েনস্ মানুষ চিন্তাশীল। যোগাভ্যাস ও আত্মার স্বাধীনতার আকুল আকাঙ্ক্ষা সম্ভব চিত্তকে খুন করার মতো একটি বিশাল মুখোমির পরে।'

হিন্দুরা দার্শনিকভাবে কোনদিনই উদার নয়— তা বেনার হত্যা, শম্বুকের শিরচ্ছেদ ও চার্বাকদের তাড়িয়ে বেড়ানোতেই প্রমাণিত। যাঁরাই বেদের সত্যাসত্য যাচাই করতে চেয়েছেন তাঁরাই নিগৃহীত হয়েছেন হিন্দুদের হাতে। বেদান্তবাদীদের হাতে নিগৃহীত হয়েছেন বুদ্ধ মহাবীরের অনুগামীরা। অনেক হিন্দুরাজা, শঙ্করাচার্যের অনুগামীরা বৌদ্ধদের বহু স্মৃতিস্তম্ভ এবং কেন্দ্র ধ্বংস করেছেন। এ সমস্ত কার্যকলাপই হিন্দুদের অসহনীয় মানসিকতাকে প্রতিফলিত করে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এ কারণেই হিন্দুধর্ম অননমনীয়, হিংস্র ও প্রতিহিংসাপরায়ণ বলতে কুণ্ঠা বোধ করেননি।

ড. নারলা বস্তুবাদী দর্শনের ছাত্র। কিন্তু এই বক্তৃতায় ভাববাদী ও বস্তুবাদী দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা করতে চাননি— বলতে চেয়েছেন— হিন্দুরা যেভাবে মুক্ত চিন্তার, সব মতাদর্শের সমান সুযোগের কথা বলেন আদৌ তা কখনো ছিল না এবং এখনও নেই। হিন্দু হলে কতগুলি মৌলিক বিষয় আছে যা সম্পর্কে প্রশ্ন করা যাবে না:

১. বেদ হচ্ছে স্বর্গীয় সত্য।
২. বেদান্ত এমনই মহৎ যে দেশী বা কোনো দার্শনিক তত্ত্বের উৎকর্ষই তার ধারে কাছে পৌঁছতে পারবে না।
৩. পার্থিব জগত মায়া, আত্মাই এক এবং একমাত্র সত্য।
৪. শুধু অবিরাম পুণ্যার্জনের মধ্য দিয়েই জন্মমৃত্যুর চক্র ভেঙে জীবাত্মা পরমাত্মায় বিলীন হতে পারে।
৫. অসাম্য প্রকৃতির নিয়ম; অতীত জীবনের কর্মফলই বর্তমান জন্মের সামাজিক বর্ণ নির্ণীত করে দেয়।
৬. বর্ণাশ্রম ধর্ম অনড়, এই ধর্ম অমান্য করলে পৃথিবী ধ্বংস হবে।

এই বিধানগুলির একটিও ঋকবেদে খুঁজে পাওয়া যাবে না, বরং ঋকবেদে পার্থিব জীবনই আলোচিত সেখানে স্বর্গের ব্যাপার নেই। আত্মা ও বস্তুর কোনো পার্থক্য ঋকবেদে পাওয়া যাবে না। ড. নারলা কুনহান রাজার মন্তব্যটি উদ্ধৃত করেন— 'যদি আমায় কেউ প্রশ্ন করে যে বৈদিক সংস্কৃতির মর্মার্থ কী, তবে আমার উত্তর -- এই সুন্দর পৃথিবীতে একটি সুখী জীবন গড়ে তোলা।'

আর্যদের এদেশে আসা এবং ঋকবেদ সৃষ্টির আলোচনা করে তিনি দেখান যে তাদের ছিল সুখাদ্য ও মদে দারুণ আসক্তি এবং যৌনসুখে তারা পরমানন্দিত হতো; তাদের একদিকে কাব্য-সঙ্গীত-নৃত্য-নাটক প্রিয় ছিল অন্যদিকে ঘোড়দৌড় ও জুয়া।

স্তোত্র রচনা করা ছিল তখনকার দিনে অন্যতম পেশা। এক-একজন রচয়িতা ইদানিং কালের সিনেমার গীতিকারদের থেকেও বেশি পয়সা পেতো। ঋকবেদে বর্ণাশ্রমের কোনো ব্যাপার ছিল না। তিনি তাঁর মতের সমর্থনে আর. সি. দত্তের একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি উল্লেখ করেন—"বর্ণ এই বিশেষ শব্দটি সংস্কৃততে জাত (কাস্ট) বোঝালেও ঋকবেদে তা ব্যবহৃত হতো আর্য ও অনার্য বোঝাতে। 'ক্ষত্রিয়' শব্দটি পরবর্তীকালে সংস্কৃতে যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে ঋকবেদে তা হয়নি— ঋকবেদে তার ব্যবহার বিশেষণ রূপে, শক্তিশালী অর্থে। 'বিপ্র' শব্দটিও জ্ঞানীর বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হতো। এমনকি 'ব্রাহ্মণ' শব্দটি ঋকবেদে একশো জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে স্তোত্রের রচয়িতা হিসেবে।"

ড. নারলার মতে ঋকবেদ ছিল "জয়ের যুগ, উপনিবেশ সম্প্রসারণের যুগ। তাদের স্লোগান ছিল 'চরৈবেতি!" (এগিয়ে চলো! এগিয়ে চলো!) ফলে তাদের হাতে শ্রেণী বা জাত নিয়ে চর্চার সময় ছিল না। ঋকবেদ শেষ হচ্ছে ঐক্যের আবেদন দিয়ে— তার কাছে পার্থিব জগত কখনোই মায়া নয়। আলবার্ট সুইৎজার এবং এস. কে মূর্তির মতামত অস্বীকার করে নারলা বলেন ঋকবেদের সময়কার মানুষের পৃথিবী ও জীবনের প্রতি ভালোবাসা ছিল অদম্য। ক্রমে ক্রমে এবং মন্থর গতিতে পৃথিবীর ও জীবনের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলালো— এবং ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে তাই প্রতিফলিত হয়েছে। ঋকবেদ ও উপনিষদের মধ্যে আনুমানিক পাঁচশো বছরের তফাত, আর এই সময়ের মধ্যেই সিন্ধু ও গাঙ্গেয় উপত্যকা আর্যরা দখল করে নিয়েছে। যাদের আর্যরা নিজস্ব সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে টানতে পারেনি তারা হয়েছে তাদের ভাষায় শূদ্র এবং যারা তাদের প্রভুত্ব না মেনে গহন অরণ্যে কিংবা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছে তারা হয়েছে চণ্ডাল বা অস্পৃশ্য।

ঋকবেদে যা ছিল না সেই পুনর্জন্ম ও কর্মফল কি করে বিধান হিসাবে এল তার কাহিনী জানা যায় বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদে। বিদেহরাজ জনক তাঁর যজ্ঞকালে উপস্থিত ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের জন্য একটি দানের ব্যবস্থা করলেন। এক হাজার গোরু ও তাদের শিং-এ দশ পাদ (তখনকার একক) স্বর্ণমুদ্রা বেঁধে দিয়ে বললেন— 'আপনাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই এই উপহার গ্রহণ করুন।' ব্রাহ্মণেরা একে অপরের মুখের দিয়ে চেয়ে আছেন। এমন সময় যাজ্ঞবল্ক তাঁর শিষ্যকে গোরুগুলি তাঁর আশ্রমে নিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন। অন্য ব্রাহ্মণরা রুষ্ট হয়ে যাজ্ঞবল্ককে তর্কে আহ্বান করলেন। একে একে সবাই পরাভূত হলে এগিয়ে এলেন জারৎকারব আর্তভাগ নামে এক প্রসিদ্ধ ব্রহ্মণ। তুমুল তর্কের মুহূর্তে যাজ্ঞবল্ক বললেন— 'আহর সোম্য হস্তমার্ত-ভাগাবাবে বৈতস্য বৈদিষ্যাবো না নাবেতৎ সজন ইতি।' (সৌম্য আর্তভাগ তোমার হাত আমাকে দাও। আমরা দুজনে এই রহস্য জানব। কিন্তু এই জনবহুল স্থানে তা হবার নয়।) এরপর তাঁরা দুজনে বেরিয়ে গেলেন এবং ফিরে এলেন— বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলছে তাঁরা ফিরে আসতে আমরা জানলাম তাঁরা কর্ম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং

কর্মের প্রশংসা করেছেন। তাঁরা একমত হয়েছেন যে পুণ্যকর্ম দ্বারা পুণ্যবান হয় এবং পাপকর্ম দ্বারা পাপী হয়। জারৎকারব আর্তভাগ ও যাজ্ঞবল্ক্যের সমঝোতার মধ্যে কি ব্যক্তিগত চুক্তি হয়েছিল, লেন-দেন হয়েছিল তা আমাদের জানা নেই কিন্তু সেই থেকেই কর্ম ও কর্মফলের অনিবার্যতা মেনে নেওয়া শুরু হল।

যুক্তির দৃঢ় ভিত্তি না থেকেও কর্ম এবং পুনর্জন্ম হিন্দু জীবনধারা ও তত্ত্বের মূল। এর এত ক্ষমতা যে বুদ্ধ-মহাবীরের মতো নিরীশ্বরবাদীরাও পুনর্জন্ম এবং কর্মফলে বিশ্বাসী ছিলেন। এবং এই একটি জায়গায় অন্যান্য ধর্ম, বিশেষত খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের একটি মৌলিক পার্থক্য আছে— খ্রিস্টান বা ইসলাম ধর্মের মতো ঈশ্বরে অবিশ্বাস হিন্দুধর্মে ক্ষমার অযোগ্য নয় কারণ শাসক ও এলিট সমাজের প্রভুত্ব এই অবিশ্বাসে নষ্ট হয় না কেননা তাদের প্রভুত্ব টিকে আছে কর্মফল ও পুনর্জন্মের বিশ্বাসের উপর— সাধারণের মনে এই বিশ্বাস অটুট রাখাই হিন্দু মাতব্বরদের আদর্শ।

জালিয়াতি হিন্দুদের জাতীয় ঐতিহ্য। কোনো মৌলিক রচনার মধ্যে পছন্দমতন বিষয় সংযোজিত করা এবং অপছন্দের বিষয় বিলোপ করাই— এবং এইরকম সম্পাদিত রচনাই মৌলিক বলে চালানোটা হিন্দুদের ঐতিহ্য। দীর্ঘদিন গবেষণা করে জার্মান পণ্ডিত রুডলফ ওটো দেখান যে গীতার মূল শ্লোক ছিল মাত্র তিয়াত্তরটি। গবেষণায় আরও দেখা যায় মহাভারতে মূল শ্লোক ছিল আট হাজার আটশো— তখন তার নাম ছিল 'জয়া'। পরবর্তী সংস্করণে তার নাম বদলে হল 'ভারত' এবং শ্লোকের সংখ্যা হল চব্বিশ হাজার; এখনকার মহাভারতে সেই সংখ্যা ছিয়ানব্বই হাজার আটশো ছত্রিশ। রামায়ণের অবস্থা তথৈবচ। এবং এসব করা হয়েছে নিছক খেয়ালে নয়, বরং উদ্দেশ্যমূলক-ভাবেই— অন্য দার্শনিকমতাবলম্বীদের ও তাদের কার্যকলাপকে হেয় করতে। গৌতমবুদ্ধ ও মহাবীর দুজনেই বর্ণ ক্ষত্রিয়— এবং এঁরা নিজেদের জাত (কাস্ট)-কে নিজেদের কর্ম দিয়ে ব্রাহ্মণের চেয়ে উঁচুতে তুলে নিয়েছিলেন। এদের টেনে নামাতে হবে, অতএব ক্ষত্রিয় ভীষ্মকে দিয়ে ক্ষত্রিয় যুধিষ্ঠিরকে বলানো হচ্ছে রাজার প্রধান কর্তব্য ব্রাহ্মণদের সেবা করা। অনুশাসন পর্বে বলানো হচ্ছে— 'রাজমুকুটধারী ক্ষত্রিয়দের প্রধান কাজ শিক্ষিত ব্রাহ্মণের সেবা করা··· যদি ব্রাহ্মণেরা অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হয় তবে সর্বাকছু ধ্বংস হয়ে যাবে।' এরকম অসংখ্য সংযোজন পাওয়া যাবে— যার তুলনায় আর সমস্ত সাহিত্য-ঘটিত জালিয়াতি ম্লান হয়ে যায়।

আরও একটি অপরাধ, মিথোলজির ব্যাখ্যায় তারা নিয়ে এল অবতারের তত্ত্ব। বুদ্ধকে বানালেন অবতার। এরই পাশাপাশি 'ভক্তি'। 'মহকাব্য' ও 'পুরাণ' হচ্ছে শূদ্রদের গ্রন্থ। আইনপ্রণেতাদের অন্যতম গৌতমের ভাষ্য— শূদ্রেরা বেদপাঠ শুনলে তাদের শ্রবণেন্দ্রিয় বন্ধ করে দেওয়া হবে উত্তপ্ত তরল ধাতু ঢেলে; তারা বেদপাঠ করলে জিভ কেটে নেয়া হবে; এবং যা পাঠ করেছে তা যদি সে মনে রাখতে পারে তবে তার দেহ

বিশ্লেষিত করা হবে। এটা বেশ মজার যে যে-কোনো ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থটি সেই ধর্মের সকল সদস্যদের জন্য, যেমন বাইবেল সব খ্রিস্টানদের, কোরান সব মুসলমানদের কিন্তু হিন্দুদের উচ্চবর্গীয়দের জন্য বেদ এবং নিম্নবর্গীয়দের জন্য মহাকাব্য এবং পুরাণ। এ সবই বেদান্তবাদীদের অদ্ভুত মনীষার ফের!

মধ্যযুগীয় ভক্তিবাদ এবং তার সন্ত দাদু, কবীর, রাজ্জাব প্রমুখ এবং সর্বশেষ চৈতন্য বর্ণাশ্রম কিংবা অস্পৃশ্যতা মানতেন না ঠিকই কিন্তু শেষ পর্যন্ত এঁদের কার্যক্রম কিছু সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায় সৃষ্টি করে সমাজকে আরও টুকরোই করেছে— সামাজিক বিন্যাস তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। ড. নারলার মতে ভক্তি আন্দোলন আরেকভাবে মানুষের মুক্তচিন্তার ক্ষতিই করেছে। যদিও তিনি ডি. পি. মুখার্জির সঙ্গে একমত যে ভক্তি আন্দোলন ছিল বুদ্ধিবাদের বিরোধী এবং এই আন্দোলন ভারতের প্রধান প্রধান ভাষার সাহিত্যে তার অবদান রেখে গেছে। ড. নারলার অপছন্দ ব্যক্তিগত ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যম ভক্তিবাদের মোক্ষে পৌঁছবার সরল ও নিশ্চিত পথের আসক্তিতে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি, শূন্য আবিষ্কার নিশ্চয়ই গর্বের বিষয় কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক আবিষ্কারের ভিত্তি বেদ এটা মেনে নেয়া যায় না। ড. নারলা দৃঢ়ভাবে দাবি করেন যে আমাদের এই মানসিকতাই এদেশে ইসলাম-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান আসার পর তার থেকে ইতিবাচক কিছু গ্রহণ করতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অথচ সারা পৃথিবী জানে যে ইউরোপের আধুনিক সভ্যতা ইসলাম-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের কাছে কতখানি ঋণী। আলবেরুনির রচনা উল্লেখ করে তিনি দেখান যে ভারতীয়রা কি-পরিমাণে অহংকারী ছিল— তারা মনে করত এই মর্তলোকে দেশ-জাতি হিসাবে তারাই মহত্তম; তাদের মতো ধর্ম, তাদের মতো জ্ঞান-বিজ্ঞান কারো নেই। কার্যত ইসলাম সংস্কৃতি থেকে হিন্দুরা যা গ্রহণ করেছিল তার বেশিরভাগটাই ছিল তাদের সংস্কৃতির খারাপ দিক। পক্ষান্তরে ইসলামও যা গ্রহণ করল তা হিন্দুদের নিম্নমানের সামাজিক রুচি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়— হিন্দুরা নিল মুসলমানদের পর্দা, মুসলমানরা নিল হিন্দুদের জাতপাত।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে বুদ্ধিবাদের এই চেহারার মূলে মুক্তমনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা বিচার করার মানসিকতাসম্পন্ন এবং সুতার্কিক বুদ্ধির অধিকারী উদ্দালকের পরিবর্তে যাজ্ঞবল্ক্যকে 'জাতীয় দার্শনিক' নির্বাচন। যাজ্ঞবল্ক্যের বিচারে আত্মা বাস্তব, শিং-এ বাঁধা সোনা সমেত গোরু বাস্তব, শুধু এই পার্থিব জগত অবাস্তব। উদ্দালক বিশ্বাস করতেন সবই বাস্তব, এই জগতের সবকিছুরই মূলে বস্তু, এককথায় বলতে গেলে যাজ্ঞবল্ক্য হচ্ছেন শব্দের ভোজবাজ বিপরীতে উদ্দালক বিজ্ঞান-চেতনা সম্বলিত একজন দার্শনিক। উদ্দালকই আমাদের প্রথম বিজ্ঞানমনস্ক দার্শনিক, আদর্শবাদী দার্শনিক। আমাদের উদ্দালকের অনুগামী হওয়াই উচিত ছিল।

এমন কোন প্রতারণা, অপরাধ, নিষ্ঠুরতা নেই যা ধর্মের নামে হয়নি

আগেই বলেছি প্রায় তিন হাজার বছর আগে যেমন ভুল হয়েছিল উদ্দালকের পরিবর্তে যাজ্ঞবল্ক্যের নির্বাচন ঠিক তেমনই ভুল হয়েছে হেনরী লুই ডিরোজিও-র পরিবর্তে রাজা রামমোহন রায়ের নির্বাচন।

'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনের মেরুদণ্ড, বাংলার নব্যযুগের প্রধান পুরুষ ডিরোজিও শেখাতে চেয়েছিলেন সবকিছুকে সন্দেহ কর, পরীক্ষা কর, তারপর গ্রহণ কর— তা যদি ফ্রান্সিস্ বেকনের সুচিন্তিত বচন হয়, তবুও। এই নব্য-চেতনার দ্রুত সমাপ্তি নিয়ে এলেন রামমোহন রায়। গান্ধী রামমোহনকে 'বামন' বলে ভুল করেছিলেন এবং গান্ধীর এই মতের যথাযথ বিরোধিতা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ— আসলে রামমোহনের প্রভাব ছিল সুদূর বিস্তৃত। অভিজাত মুসলিমদের মতো পোশাকে, হিন্দু উদারবাদীদের মতো জীবনধারণে, খ্রিস্টান একেশ্বরবাদীর মতো চিন্তাভাবনা নিয়ে তিনি যা করেছিলেন তা বিস্ময়কর— তাঁর আর্থিক উৎসাহ ছিল ভূস্বামীদের ও মুৎসুদ্দিদের সঙ্গে জড়িত যদিও তাঁর বুদ্ধিবাদী উদ্দীপনা স্বপ্ন দেখতো স্বাধীনতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে গঠিত সর্বসাধারণের এক মঙ্গলময় বিশ্বের। সাধারণত তিনি যুক্তির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন কিন্তু প্রায়ই ধর্ম-বিশ্বাসের দিকে ঘুরে দাঁড়াতেন। মূর্তি পূজায় অবিশ্বাসী হয়েও তিনি কিছু সময়ের জন্য তান্ত্রিকতা চর্চা করেছেন— যা মূর্তি পূজার চেয়েও খারাপ। এবং সবসময়েই যার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায় না এমন জিনিসের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করতেন। তাঁর জীবন এবং চিন্তাভাবনার বৈপরীত্যই এর কারণ। আসলে বিজ্ঞানাভিত্তিক ধর্ম করতে গেলে না বিজ্ঞান চর্চা হয়, না ধর্ম চর্চা হয়। এবং রামমোহন নিজেও তা বুঝতেন।

১৮২৩ সালে তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে লিখিত চিঠিতে সংস্কৃত স্কুল স্থাপন ও সংস্কৃত চর্চার বিরোধিতা করে রামমোহন যখন তাদের জানাতে চান যে বেকনের আগে ইউরোপে যে রকম মধ্যযুগীয় চিন্তাভাবনা ছিল ভারতে তা আনার প্রয়োজনীয়তা হাস্যকর, এখানে চাই বেকনীয় দার্শনিক পরিমণ্ডলের উপযুক্ত শিক্ষা— সেই রামমোহন 'বেকন সমাজ' প্রতিষ্ঠা না করে 'ব্রাহ্ম সমাজ' কেন প্রতিষ্ঠা করতে গেলেন এটাই ড. নারলার জিজ্ঞাসা। এবং তিনি নিজেই উত্তর দেন— রামমোহন চেয়েছিলেন ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার, বৈজ্ঞানিক বিপ্লব নয়। রামমোহনের চিন্তাভাবনার দিক উল্লেখ করে তিনি বলেন সামাজিক সংস্কার থেকে ধর্মীয় বিশ্বাসকে আলাদা করা উচিত এবং এক কিম্বা বহুঈশ্বরের পূজা সবই আসলে যুক্তির উপরে ধর্মবিশ্বাস, মুক্ত চিন্তার উপর প্রভুত্বকে স্থান দেয়। এবং এ কারণে খুব সঠিকভাবেই ডিরোজিও শুরু করেছিলেন সবরকম ধর্মীয় শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার উপর। কার্যত রামমোহনের বেদান্তচিন্তা মুক্ত চিন্তাতে অবরোধ তুলেছিল, ক্ষতি করেছিল বুদ্ধিবাদের। এবং রেনেশাঁসের সোনালী আকাশ ক্রমে আঁধারে ঢেকে গেল।

রামমোহনের মৃত্যুর পর কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ব্রাহ্মধর্ম সর্বভারতীয় এলিটিস্ট আন্দোলনের রূপ নিলেও রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর মতোই ধর্মীয় সংগঠনটিও টুকরো-টুকরো হল। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি এক কথায় ভারতীয় চিন্তা ভাবনার জগতে প্রচুর অবদান থাকা সত্ত্বেও প্রচলিত ভারতীয় জীবন ও চিন্তাধারার উপরিতলে সামান্য আঁচড় কাটা ছাড়া কিছুই করতে পারেনি এই ধর্মীয় আন্দোলন। এবং এই আন্দোলনের পুনরুত্থানেরও আর সম্ভাবনা নেই

ব্রাহ্ম নেতাদের বিপরীতে বিদ্যাসাগরের পোশাক এবং জীবন ধারণ ছিল প্রচলিত ব্রাহ্মণদের মতো। তথাপি তিনি বেদান্তবাদী ছিলেন না। কদাচিৎ বেদান্ত বা উপনিষদের উল্লেখ করতেন, কখনো পূজো করতেন না। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করতেন তিনি অজ্ঞেয়বাদী (agnostic)। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁর এই শিক্ষককে মনে করতেন নাস্তিক। দৃষ্টবাদীদের ঘনিষ্ঠ হয়েও তিনি কখনও তাঁদের কাজকর্মে অংশগ্রহণ করেননি, মোহিত হননি রামকৃষ্ণে। অধিবিদ্যার আলোচনায় অনাগ্রহী বিদ্যাসাগর ছিলেন যুক্তির পক্ষে প্রত্যাদেশের বিপক্ষে, ঈশ্বরের জন্য নয় মানুষের জন্য নিবেদিত প্রাণ। ড. নারলা মনে করেন, শুধুমাত্র শিক্ষার প্রসার, বিশেষত নারী-শিক্ষার এবং বিধবাবিবাহের মধ্যে সীমিত না থেকে তিনি যদি বৃহত্তর আঙ্গিনায় নিজেকে নিয়োজিত করতেন তবে ভারতীয় রেনেসাঁস বিপথগামী হতো না। ডিরোজিও-র ঘাটতি ছিল ভারতীয় ঐতিহ্য ও সভ্যতার সম্পর্কে। সেসব সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল, মুক্তমনা পশ্চিমী যুক্তিবাদীর চিন্তায় সমৃদ্ধ বিদ্যাসাগরই ডিরোজিও-র ধারাকে সঠিক পথে চালিত করতে পারতেন। কিন্তু পারলেন না! নারলা মনে করেন তার মুখ্য কারণ তাঁর অনুগামী ও কাছের মানুষদের থেকে বহু হৃদয়বিদারক আক্রমণ তাঁর ওপর হয়েছে, এক কথায় তাঁকে ক্লান্ত করে দিয়েছে।

দয়ানন্দ সরস্বতীর কথা আলোচনা করতে গিয়ে ড. নারলা বলেন তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল মহাকাব্য ও পুরাণ সমেত জনপ্রিয় হিন্দুধর্মের মূলোৎপাটিত করা, উপনিষদ-ব্রহ্মসূত্র-ভগবতগীতা সমেত বেদান্তকে অগ্রাহ্য করা, এবং বৈদিক যুগকে পূর্ণ সমাদরে পুনরায় ফিরিয়ে আনা। তিনি মনে করতেন সব ধর্মের মধ্যে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম হচ্ছে ভীষণ শিশুসুলভ, তুচ্ছ। দয়ানন্দের এই উদ্দেশ্যের অংশীদার হতে তাঁর আপত্তি থাকত না কিন্তু দয়ানন্দের এই ঝোঁক তাঁকে আরেকটি চরম দিকে নিয়ে গেলো, যেখানে তিনি বিশ্বাস করেন বেদ সমস্ত জ্ঞানের আধার এমনকি আধুনিক বিজ্ঞানেরও এবং ঈশ্বর নিজেই বেদ সৃষ্টি করেছেন। বেদ সম্পর্কিত দয়ানন্দের এই মানসিকতাকে সমর্থন জানিয়েছেন অরবিন্দ।

দয়ানন্দের আর্যধর্মেরও অন্যতম উপাদান অসহিষ্ণুতা। অনার্যদের তারা দাস এবং দাসু* বলে ডাকত, লিঙ্গ-পূজারীদের মতো তাদের ঘৃণাসহকারে পরিহার করত, নাক-চ্যাপ্টা বলে বিদ্রূপ করত, তাদের ভাষা কর্কশ বলে অবজ্ঞা করত; বাস্তবিক তাদের

* Slaves and thieves.

সম্পর্কেও একটাও ভাল কথা বলত না। ইসলাম ও খ্রিস্টানদের সঙ্গে তাদের বিরোধ ছিল হিংসাত্মক এবং গালিগালাজপূর্ণ। যদিও ব্রাহ্মধর্মের মতো আর্য সমাজের চিন্তা ভাবনায় ও কাজে কিছু প্রগতিশীল ও যুক্তিবাদী উপাদান ছিল। কিন্তু সংস্কারমূলক কাজকর্মে তারা এক-পা এগিয়ে দু'-পা পিছিয়েই গেল।

থিয়োজফিক্যাল সোসাইটি আমাদের এক-পা না এগিয়েই বারো-পা পিছিয়ে দিয়েছে। এঁরা হিন্দুধর্মীয়-সাহিত্যের সবটাই সংকলিত করল একেবারে অলঙ্ঘণীয় মনে করে। এই সোসাইটিতে হাজার হাজার শিক্ষিত ভারতীয় বিশেষত হিন্দুরা ভিড় করেছিল কেন? আমাদের মূর্খের মতো বিশ্বাসগুলি, নোংরা রুচিগুলি এবং অর্থহীন ঐতিহ্য-গুলির যথার্থতার বৈজ্ঞানিক বিচার করার যে প্রয়াস সোসাইটি দেখিয়েছিল তা আমাদের ক্ষতিই করেছে। যদিও এই সোসাইটির আজ আর কোনো বিশেষত্ব নেই তবুও যোগি-যোগিনী-ভগবান-মা-ভ্রাতা ইত্যাদির জন্মাবার জন্য এই সোসাইটিই দায়ী বলে ড. নারলা মনে করেন।

বেদান্তবাদী হয়েও মূর্তিপূজোয় বিশ্বাসী গুরু-শিষ্য রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাব আজও অটুট। 'হিন্দু নেপোলিয়ন' বিবেকানন্দ শুধু হিন্দুদের জন্য নয় পশ্চিমী বস্তুবাদী জগতে নিয়ে এলেন আধ্যাত্মবাদের বার্তা। এবং বিবেকানন্দই হিন্দুধর্মের ইতিহাসে প্রথম মিশনারি কার্য-কলাপ শুরু করলেন। হিন্দু কর্মফলে যেভাবে সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলি ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলা হয়েছে তার সঙ্গে মিশনারি কার্য-কলাপ স্ববিরোধী— এবং সে কারণেই রামকৃষ্ণমঠের অন্যান্য সদস্যরা তাঁর এই কার্য-কলাপকে হিন্দু-বিশ্বাস ও ঐতিহ্যবিরোধী বলে মনে করতেন। কোনো রাজনীতিক নয় বিবেকানন্দই বলেছিলেন যুগটা সমাজতন্ত্রের যুগ এবং তিনি মনে করতেন সন্ধেবেলা গীতাপাঠের চেয়ে যুবকদের একঘণ্টা ফুটবল খেলা অনেক কাজের।

এরপরে ড. নারলা মহারাষ্ট্রের ঊনবিংশ শতাব্দীর জীবন ও চিন্তাভাবনা নিয়ে আলোচনা করে দেখান যে তা বেদান্ত নিয়ন্ত্রিত নয় বরং যুক্তিবাদ নিয়ন্ত্রিত। যাঁদের অন্যতম গোপালরাও দেশমুখ, জ্যোতিরাও ফুলে এবং গোপাল গণেশ আগরকার। ফুলে ছিলেন পেশায় একজন মালি। তিনি সেখান থেকে 'মহাত্মা' হিসাবে উঠে এসেছিলেন। গোপালকৃষ্ণ গোখলের গুরু মহাদেব গোবিন্দ রানাড়ে বোম্বে হাইকোর্টের একজন জজ হিসাবেও গোপনে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের তাত্ত্বিক নির্দেশক ছিলেন। বি. আর. আম্বেদকরও ফুলে ও রানাড়েকে শ্রদ্ধা করতেন।

গান্ধী সম্পর্কে কিছু বলার আগে নারলা আমাদের জানিয়ে দেন কংগ্রেস-সেবীরা সাধারণভাবেই ধর্মীয় মনোভাবাপন্ন এবং জ্যোতিষবিদ্যা, হস্তরেখাবিদ্যা, তান্ত্রিকতায় বিশ্বাসী। তিনি মনে করেন এটা সম্ভবত তাঁরা জন স্টুয়ার্ট মিল ও লর্ড মোরলির দ্বারা প্রভাবিত বলেই।

গত দুশো বছরে আমাদের ইতিহাসে গান্ধীর সমতুল্য কোনো প্রভাবশালী মানুষ

আসেননি। তথাপি বলা যায় তিনি তত্ত্বগতভাবে আমাদের এক ইঞ্চিও এগিয়ে দিতে পারেননি। 'মানুষ গান্ধীর দর্শনের কথা বলেন'— নারলা বিনয়ের সঙ্গে বলেন সত্যি এমন কিছু নেই যা গান্ধীর দর্শন। তাঁর কিছু বিশ্বাস ছিল, কিছু প্রত্যয় ছিল এবং কিছু খ্যাপামি ছিল। এগুলি তিনি পেয়েছিলেন কোনটা হিন্দু, কোনটা জৈন, কোনটা খ্রিস্টধর্ম থেকে— এবং আর কিছুটা পেয়েছিলেন থোরে, টলস্টয়, রাস্কিন এবং এডওয়ার্ড কার্পেন্টারের কাছ থেকে। এ এক জগা-খিচুড়ি ব্যাপার যা পাওয়া যায় ভগবত গীতায়। আর এ কারণেই গান্ধী গীতাকে পবিত্র বলে মনে করতেন। তাঁর লেখায় বা বক্তৃতায় যা পাওয়া যায় সবই সেই 'হিন্দু স্বরাজ'-এর বিষয় যা তিনি লিখেছিলেন ১৯০৮ সালে। ডাক্তার প্রয়োজন নেই এবং ডাক্তার অসংযম, কদভ্যাস, পাপ জাগিয়ে দেয় — এই মানসিকতা নিয়ে তিনি প্রচার করতেন। মনে করতেন হৃদয় দিয়ে রামায়ণ পাঠ করলে সব রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু সবকিছু সিকেয় তুলে অ্যাপেন্ডিসাইটিস অপারেশনের জন্য তাঁকে আধুনিক হাসপাতালে যেতেই হল। শুধু ডাক্তার নয়, হাসপাতাল, আইনজীবী, আদালত এমনকি রেলপথেরও তিনি বিরোধী ছিলেন।

কার্যত একজন ধর্মীয় মানুষ হিসাবে গান্ধী বুদ্ধির চেয়ে তাঁর অন্তরের উপলব্ধিকে মুখ্য বলে মনে করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন তাঁর অন্তরের বাণী ঈশ্বরেরই বাণী। ড. নারলার মতে গান্ধীর বুদ্ধিবাদ-বিরোধী মানসিকতা ভারতের প্রভূত ক্ষতি করেছে।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ড. নারলা বলেন অতীন্দ্রিয়বাদী হয়েও তাঁর চিন্তাভাবনায় যুক্তিবাদের প্রকাশ পাওয়া যায়। এবং এ কারণেই গান্ধী যখন বিহারের ভূমিকম্পের কারণ মানুষের পাপ দেখেন তখন রবীন্দ্রনাথের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়।

বিংশ শতাব্দীর সমস্ত খ্যাত ভারতীয়দের মধ্যে ড. নারলার বিচারে এম. এন রায় হচ্ছেন একমাত্র আপোসহীন বস্তুবাদী এবং যুক্তিবাদী। ভারতীয় চিন্তা ও সংস্কৃতি তাঁর নখদর্পণে না হলেও তাঁর পশ্চিমী দর্শন বিশেষত বস্তুবাদী দর্শনে গভীর প্রজ্ঞা ছিল। এবং তিনি সঠিকভাবেই বলতেন (ধর্ম) বিশ্বাস অজ্ঞানতার জন্ম দেয়।

বক্তৃতা শেষাংশে তিনি বলেন— ইতিহাস থেকে আমরা কী শিক্ষা নিয়েছি ? কিছুই না। তাইতো এই অত্যাধুনিক বিজ্ঞানের যুগে আমরা জ্যোতির্বিজ্ঞানে চেয়ে জ্যোতিষশাস্ত্রে, গ্রহ-নক্ষত্রাদির পরিক্রমার চেয়ে হস্তরেখাবিদ্যায়, জ্যোতির্-পদার্থবিদ্যার চেয়ে বাবাদের ছাই-য়ে বেশি আগ্রহী। নারলা বলেন যে এ তাঁর অজানা নয় যে এ কথাগুলি বললেই ইউরোপ ও আমেরিকার সেইসব গোষ্ঠীগুলি, যারা ভারতের এইসব কার্যকলাপকে উৎসাহিত করছে, তাদের আক্রমণের সম্মুখীন হতে হবে।

মন সত্যিই দুর্বল কিন্তু আজ থেকে দশ হাজার বা তারও বেশি বছর আগের তুলনায় তো সবল। এবং গত পাঁচশো বছরে তা তো অভাবনীয় ক্ষমতায় বলীয়ান হয়েছে অতএব চোখ বন্ধ করে ধ্যান না করে চোখ খুলেই জগতের গতি ও তার নিয়ম অধ্যয়ন

করাই বাঞ্ছনীয়। মনে রাখা উচিত শুধু আত্মাকে অস্বীকার করলেই হবে না, যা গৌতমবুদ্ধ করেছিলেন, কর্মফল ও পুনর্জন্মবাদকেই অস্বীকার করতে হয়। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তর মতো বলতে হবে— বেদান্ত চারটি অপ্রমাণিত আপ্তবাক্য দ্বারা আবদ্ধ দর্শন : ১. বৈদিক জ্ঞানের অভ্রান্ততা, ২. পরমার্থিক মুক্তি এবং বন্ধন, ৩. কর্মের অনুশাসন এবং ৪. পুনর্জন্ম।

ড. নারলা বলেন বেদান্ত চিরকালই কায়েমি স্বার্থের ক্ষমতাশালী বন্ধু এমন কি বৃটিশদেরও ভারতীয়দের ওপর প্রভুত্বে তা সাহায্য করেছে। এবং নারলা তাঁর এই অভিমতের সমর্থনে নিরঞ্জন ধরের লেখা 'বেদান্ত এবং বেঙ্গল রেনেশাঁস' বইটির থেকে উদ্ধৃতি দেন।

আগামী দিনে বেদান্তর সঙ্গে এবং বিভিন্ন ধর্মীয় মতাদর্শগুলির বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়েই 'ভারতীয় বুদ্ধিবাদের দীনতা' ঘুচে প্রকৃত বুদ্ধিবাদ সম্প্রসারিত হতে পারে এটাই ড নারলার বক্তব্যের প্রতিপাদ্য বিষয়।

আমাদেরও সেই তেলেগু প্রবাদটি মনে রাখতে হবে— 'বেদান্তবাদীরা আসছে, ঘটি-বাটি-র ওপর নজর রাখো।' □